খুলাফায়ে রাশেদিনের জীবনকথা

রচনা ও বিন্যাস
মাওলানা হাজি মুঈনুদ্দিন নদভি রহ.
সদস্য, দারুল মুসান্নিফিন

মুজাহিদুল ইসলাম মাইমুন
অনূদিত

ইত্তিহাদ

সূচিপত্র

গ্রন্থ পরিচিতি **২১**
লেখকের ভূমিকা **২৪**

খলিফাতুর রাসুল আবু বকর সিদ্দিক রা.

নাম ও বংশ ৩৩
আবু বকর সিদ্দিক রা.-এর পিতা ৩৩
আবু বকর সিদ্দিক রা.-এর মাতা ৩৪
ইসলাম-পূর্ব জীবন ৩৫
ইসলাম গ্রহণ ৩৫
ইসলাম প্রচার ৩৬
মক্কি-জীবন ৩৭
হাবাশায় হিজরতের ইচ্ছা ও প্রত্যাবর্তন ৩৮
মদিনায় হিজরত ও নবীজির খেদমত ৪০
ভ্রাতৃবন্ধন ৪৫
মসজিদ নির্মাণ ৪৫
গাজওয়া ৪৬
বদর যুদ্ধ ৪৬
উহুদ যুদ্ধ ৪৭
বনু মুস্তালিক যুদ্ধ এবং ইফকের ঘটনা ৪৮
হুদাইবিয়ার ঘটনা ৫০
হজের নেতৃত্ব প্রদান ৫২
সিদ্দিকে আকবার রা.-এর খেলাফত **৫৩**
সাকিফায়ে বনু সায়েদা ৫৫
আলি রা.-এর বাইয়াত ৫৭
খেলাফত **৫৮**
উসামা ইবনে জায়েদ রা.-এর অভিযান ৫৮

নবুওয়াত দাবিদারদের দমন ৫৯
মুরতাদদের দমন ৬০
জাকাত অস্বীকারকারীদের সতর্কীকরণ ৬১
কুরআন সংকলন ও বিন্যস্তকরণ ৬১
একটি ভ্রান্তি নিরসন ৬২
কুরআনের আয়াত নবীযুগেই ধারাবাহিকভাবে সংকলিত হয়েছিল ৬২
সিদ্দিক রা. কুরআনের বিক্ষিপ্তাংশকে একটি কিতাবে রূপ দিয়েছিলেন ৬৩
কতদিন পর্যন্ত সিদ্দিক রা.-এর এই সহিফা সংরক্ষিত ছিল? ৬৩
বিজয়সমূহ ৬৪
ইরাক যুদ্ধ ৬৬
শাম অভিযান ৬৭
বিবিধ বিজয় ৬৮
মৃত্যুশয্যা এবং উমর ফারুক রা.-এর স্থলাভিষিক্তি ৬৮
কীর্তি ও অবদান ৭১
খেলাফতব্যবস্থা ৭২
রাষ্ট্রপরিচালনার নীতিমালা ৭২
শাসকদের নেগরানি ৭৪
শাস্তি ও দণ্ডবিধি ৭৫
আর্থিক বিষয়াদি ৭৭
সামরিক ব্যবস্থাপনা ৭৮
সৈন্যদের নৈতিক প্রশিক্ষণ ৭৮
যুদ্ধ সরঞ্জামের ব্যবস্থাকরণ ৭৯
সেনাছাউনি পর্যবেক্ষণ ৭৯
বিদআতের দ্বার রুদ্ধকরণ ৮০
হাদিসের খেদমত ৮০
ফাতাওয়া বিভাগ ৮১
ইসলাম প্রচার-প্রসার ৮২
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে ওয়াদা পূরণ ৮৩
আহলে বায়াতের প্রতি সদাচরণ ৮৩
অমুসলিম প্রজাদের অধিকার ৮৪
ফজিলত ও মর্যাদা ৮৬
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে তার অবস্থান ৮৬

ইলম ও শ্রেষ্ঠত্ব ৮৮
কাব্যপ্রীতি ৮৮
ভাষণ ৮৯
বংশজ্ঞান ৯০
স্বপ্নের ব্যাখ্যা ৯১
ইলমুত তাফসির ৯২
হাদিস ৯৪
ইমামত ও ইজতিহাদ ৯৫
ইজতিহাদের নীতিমালা ৯৫
কিয়াসি মাসআলা-মাসাইল বের করার ক্ষেত্রে তার ভীতি ৯৬
একটি কিয়াসি মাসআলা ৯৬
আখলাক ও অভ্যাস ৯৮
তাকওয়া তথা খোদাভীতি ৯৮
জুহদ তথা দুনিয়াবিমুখতা ১০০
বিনয় ১০১
আল্লাহর রাস্তায় দান ১০৩
সৃষ্টির সেবা ১০৫
ধর্মীয় জীবন ১০৬
পারিবারিক জীবন ১০৭
আতিথ্য ১০৭
পোশাক ও খাবারদাবার ১০৭
জীবিকানির্বাহ ১০৮
জায়গির ১০৯
শারীরিক গঠন ১০৯
স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি ১০৯

আমিরুল মুমিনিন উমর ফারুক রা.

নাম ও বংশ ১১০
ফারুকে আজম রা.-এর ইসলাম গ্রহণ ১১১
ইসলাম গ্রহণ ১১৬
হিজরত ১২০
যুদ্ধ এবং অন্যান্য অবস্থা ১২২

খেলাফত ও বিজয়াভিযান ১২৯
ইরাক বিজয় ১২৯
কাদিসিয়ার চূড়ান্ত যুদ্ধ ১৩৪
ব্যাপক সেনা অভিযান ১৩৭
শামের বিজয় ১৩৮
ইয়ারমুকের ময়দান এবং শামের চূড়ান্ত ভাগ্য নির্ধারণ ১৩৯
বাইতুল মাকদিস ১৪১
বাইতুল মাকদিস সফর ১৪১
বিচ্ছিন্ন কতিপয় যুদ্ধ ও বিজয় ১৪২
মিসর বিজয় ১৪২
শাহাদাত ১৪৩
স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি ১৪৪
ফারুকে আজমের অবদান ১৪৫
একনজরে বিজয়সমূহ ১৪৫
খেলাফতব্যবস্থা ১৪৬
জবাবদিহিতা ১৫০
রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলা ১৫৩
বাইতুল মাল তথা রাষ্ট্রীয় কোষাগার ১৫৫
নির্মাণ ও স্থাপনা ১৫৬
আবাসনব্যবস্থা ১৫৭
বসরা ১৫৭
কুফা ১৫৮
ফুসতাত ১৫৮
মুসেল ১৫৯
জিজাহ ১৫৯
সামরিক ব্যবস্থাপনা ১৫৯
ধর্মীয় অবদান ১৬৩
বিবিধ ব্যবস্থাপনা ১৬৬
ইনসাফ ও ন্যায়বিচার ১৬৮
ইলম ও শ্রেষ্ঠত্ব ১৭০
আখলাক ও আচার-আচরণ ১৭৪
আল্লাহ তায়ালার ভয় ১৭৪

নবীজির ভালোবাসা এবং সুন্নাতের অনুসরণ ১৭৬
দুনিয়াবিমুখতা ও অল্পেতুষ্টি ১৮০
বিনয় ও নম্রতা ১৮৬
কঠোরতা ও নম্রতা ১৮৭
ক্ষমা ১৯০
জনকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ড ১৯১
আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় ১৯২
সমতা রক্ষা ১৯৩
আত্মমর্যাদাবোধ ১৯৩
পারিবারিক জীবন ১৯৪

আমিরুল মুমিনিন উসমান ইবনে আফফান জুননুরাইন রা.

নাম ও বংশ ১৯৬
ইসলাম গ্রহণ ১৯৭
বিয়ে ১৯৮
হাবশায় হিজরত ১৯৮
মদিনার পথে ১৯৯
রুমা কূপ ক্রয় ১৯৯
যুদ্ধ ও অন্যান্য অবস্থা ২০০
বদর যুদ্ধ এবং রুকাইয়া রা.-এর অসুস্থতা ২০০
উহুদ যুদ্ধ ২০২
অন্যান্য যুদ্ধ ২০২
দূত হিসেবে দায়িত্ব পালন ২০৩
তাবুক যুদ্ধ এবং জাইশুল উসরার ব্যবস্থাপনা ২০৪
খেলাফত ও বিজয় ২০৬
ত্রিপোলি বিজয় ২০৮
আফ্রিকা বিজয় ২০৯
স্পেনে অভিযান ২০৯
আবদুল্লাহ ইবনে আবু সারাহকে পুরস্কার প্রদান ২০৯
কুবরুস (সাইপ্রাস) বিজয় ২১০
বসরার গভর্নরের পদচ্যুতি ২১১
তাবারিস্তান বিজয় ২১১

বিশাল সমুদ্র যুদ্ধ ২১২
বিবিধ বিজয় ২১৩
বিদ্রোহের প্রচেষ্টা এবং উসমান রা.-এর শাহাদাত ২১৩
বিশৃঙ্খলা বন্ধ ও সংশোধনের শেষ প্রয়াস ২৩২
কুফার ফেতনাবাজ লোকদের মনস্তুষ্টি ২৩৩
অবস্থা পর্যবেক্ষণকারী প্রতিনিধিদল ২৩৪
বিদ্রোহের প্রচেষ্টা ২৩৪
খেলাফত থেকে পদত্যাগের দাবি ২৩৬
অবরোধ ২৩৬
উসমান রা. কর্তৃক বিদ্রোহীদের বোঝানোর প্রয়াস ২৩৭
প্রাণোৎসর্গকারী সাথি-সঙ্গীদের পরামর্শ এবং অনুমতি প্রার্থনা ২৩৯
শাহাদাতের প্রস্তুতি ২৪০
শাহাদাত ২৪১
উসমান রা.-এর জন্য শোকাহত মুসলিম বিশ্ব ২৪৮
হজরত উসমান রা. কীর্তি ও অবদান ২৫০
একনজরে বিজয়সমূহ ২৫০
বিজয়ের পরিধি সম্প্রসারণ ২৫১
খেলাফতব্যবস্থা ২৫১
গভর্নরদের মজলিসে শুরা ২৫২
প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ ২৫২
ক্ষমতা বণ্টন ২৫৩
গভর্নরদের জবাবদিহিতা ২৫৩
রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলাব্যবস্থা ২৫৪
বাইতুল মাল ২৫৪
নির্মাণ প্রকল্প ২৫৪
মাহজুর বাধ ২৫৫
মসজিদে নববি নির্মাণ ও সম্প্রসারণ ২৫৫
সামরিক ব্যবস্থা ২৫৬
নৌ-অভিযান ২৫৭
ধর্মীয় অবদান ২৫৭
শ্রেষ্ঠত্ব ও গুণাবলি ২৫৯

পড়ালেখা ২৫৯
ওহি লিপিবদ্ধকরণ ২৫৯
লেখার শৈলী ২৫৯
ভাষণ ২৬০
কুরআনুল কারিম ২৬১
হাদিস শরিফ ২৬১
ফিকহ ও ইজতিহাদ ২৬২
ফারায়েজশাস্ত্র ২৬৪
আচার-ব্যবহার ২৬৪
তাকওয়া (খোদাভীতি) ২৬৫
নবীজির প্রতি ভালোবাসা ২৬৫
নবীজির প্রতি সম্মান ২৬৫
সুন্নাতের অনুসরণ ২৬৬
লজ্জা ২৬৭
দুনিয়াবিমুখতা ২৬৭
বিনয় ২৬৭
আত্মত্যাগ ২৬৮
দানশীলতা ২৬৮
নিকটাত্মীয় ও বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে সদাচার ২৬৯
ধৈর্য ও ক্ষমা ২৭০
ধর্মীয় জীবন ২৭০
ব্যক্তিগত অবস্থা ২৭১
বাসস্থান ২৭১
জীবিকানির্বাহ ২৭১
জায়গির ২৭১
কৃষি ২৭১
খাবারদাবার ২৭২
পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ২৭২
পোশাক-আশাক ২৭২
গঠনাকৃতি ২৭২
স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি ২৭২

আমিরুল মুমিনিন আলি মুরতাজা রা.

নাম ও বংশ ২৭৪
ইসলাম গ্রহণ ২৭৬
মক্কিজীবন ২৭৬
দাওয়াত প্রদান ২৭৭
হিজরত ২৭৯
প্রাণ উৎসর্গের বিরল দৃষ্টান্ত ২৭৯
মসজিদ নির্মাণ ২৮০
যুদ্ধ ও অন্যান্য অবস্থা ২৮১
বদর যুদ্ধ ২৮১
ফাতেমা রা.-এর সঙ্গে বিয়ে ২৮২
ফাতেমা রা. আলি রা.-এর ঘরে ২৮২
উপঢৌকন ২৮২
ওলিমার দাওয়াত ২৮৩
উহুদ যুদ্ধ ২৮৩
বনু নাজির ২৮৪
খন্দক যুদ্ধ ২৮৪
বনু কুরায়জা ২৮৪
বনু সাআদকে দমন ২৮৫
হুদাইবিয়া সন্ধি ২৮৫
খায়বার বিজয় ২৮৬
মারহাব ২৮৬
মক্কা বিজয় ২৮৭
একটি ভুলের প্রায়শ্চিত্ত ২৮৯
হুনাইন যুদ্ধ ২৯০
আহলে বাইতের হেফাজত ২৯০
নবীজি সা.-এর নির্দেশ প্রচার ২৯০
ইয়ামানে ইসলাম প্রচার ২৯১
বিদায় হজে অংশগ্রহণ ২৯১
হৃদয় ছেঁড়া বেদনা ২৯২
প্রথম খলিফা আবু বকর রা.-এর হাতে বাইয়াত হতে বিলম্বের কারণ ২৯২
খেলাফতের বাইয়াত ২৯৫

কিসাসের দাবিতে আয়েশা রা. ২৯৬
ইরাক সফর ২৯৭
হাসান রা.-এর কুফা সফর ২৯৮
জঙ্গে জামাল ২৯৯
সন্ধি প্রস্তাব ৩০৩
জঙ্গে সিফফিন ৩০৪
পানি নিয়ে দ্বন্দ্ব ৩০৪
যুদ্ধের ময়দানে সন্ধির সর্বশেষ প্রচেষ্টা ৩০৬
যুদ্ধের সূচনা ৩০৭
খারেজি দলের বুনিয়াদ ৩১০
সালিশের ফলাফল ৩১১
খারেজিদের অবাধ্যতা ৩১৩
নাহরাওয়ান যুদ্ধ ৩১৪
মিসরের সমস্যা ৩১৫
বিদ্রোহের মূলোৎপাটন ৩১৭
কিরমান ও পারস্যের বিদ্রোহ দমন ৩১৭
বিজয়ধারায় বাধা ৩১৭
হজরত আলি রা.-এর শাহাদাত ৩১৮
কীর্তি ও অবদান ৩১৯
রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা ৩১৯
গভর্নরদের নেগরানি ৩২০
কর বিভাগ ৩২১
প্রজাদের সঙ্গে সদাচার ৩২১
সামরিক ব্যবস্থাপনা ৩২১
ধর্মীয় অবদান ৩২২
তাজির (সতর্কতামূলক শাস্তি) ৩২৪
শ্রেষ্ঠত্ব ও গুণাবলি ৩২৪
তাফসির ও উলুমুল কুরআন ৩২৫
হাদিসশাস্ত্র ৩২৭
ফিকহ ও ইজতিহাদ ৩২৯
বিচারকার্য ৩৩২
হেকমত ও রহস্যবিদ্যা ৩৩৭

তাসাউফ ৩৩৯
ভাষণ ও খুতবা ৩৪০
কাব্য ৩৪২
ইলমে নাহুর উদ্ভাবন ৩৪২
আখলাক ও ব্যক্তিগত জীবন ৩৪৩
বিশ্বস্ততা ও দীনদারি ৩৪৩
দুনিয়াবিমুখতা ৩৪৪
ইবাদত-বন্দেগি ৩৪৬
আল্লাহর রাস্তায় দান-সদকা ৩৪৭
বিনয় ৩৪৮
বীরত্ব ও সাহসিকতা ৩৪৮
শত্রুদের প্রতি সদাচার ৩৫০
সঠিক মতামত ৩৫১
পারিবারিক জীবন ৩৫৮
খাবারদাবার ও পোশাক-আশাক ৩৬০
শারীরিক গঠন ৩৬১
স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি ৩৬১
গ্রন্থপঞ্জি ৩৬৩
হাদিসের কিতাব ৩৬৩
তারাজিম, তাবাকাত, তারিখ ও অন্যান্য কিতাব ৩৬৫

গ্রন্থ পরিচিতি

দারুল মুসান্নিফিন থেকে ইতিপূর্বে সিরাতুন্নবী বের হয়েছে। দারুল মুসান্নিফিনের দায়িত্বশীলগণ সিরাতের পাশাপাশি সাহাবায়ে কেরামের জীবনী গ্রন্থনার উদ্যোগ নেন। কেননা তারা ছিলেন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষাদীক্ষার বাস্তব প্রতিচ্ছবি। তাদের জীবনীর মাধ্যমে ইসলামের প্রকৃত চিত্র মুসলমানদের সামনে ফুটিয়ে তোলা ছিল দারুল মুসান্নিফিনের দায়িত্বশীলগণের উদ্দেশ্য। আলহামদুলিল্লাহ, আমাদের কিছু সাথি এ পবিত্র কাজে অংশগ্রহণ করেছেন এবং আল্লাহর অনুগ্রহে একে পূর্ণতায় পৌঁছিয়েছেন।

মোটাদাগে সাহাবিগণকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়, মুহাজিরিন ও আনসার। এই ভিত্তিতেই আমরা সিয়ারুল মুহাজিরিন ও সিয়ারুল আনসার নামে দুই অংশে সাহাবিগণের জীবনী লিপিবদ্ধ করেছি। আনসার সাহাবিগণের জীবনী কয়েক বছর পূর্বে দুই খণ্ডে 'সিয়ারুল আনসার' নামে প্রকাশিত হয়েছে। পাশাপাশি নারী মুহাজির ও নারী আনসার সাহাবিগণের জীবনীও আলাদা খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। এ ছাড়াও সাহাবায়ে কেরামের দীনি, চারিত্রিক, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক জীবনাচার-সংক্রান্ত দুই খণ্ডের একটি সংকলন 'উসওয়ায়ে সাহাবা' শিরোনামে প্রকাশিত হয়ে সকলের কাছে সমাদৃত হয়েছে।

মোটকথা, ইতিপূর্বে সাহাবিগণ সম্পর্কে দারুল মুসান্নিফিন থেকে নিম্নোক্ত খণ্ডগুলো প্রকাশ পেয়েছে।

১. **সিয়ারুল আনসার (প্রথম খণ্ড) :** এতে আরবি হরফের ক্রমধারা অনুযায়ী আলিফ থেকে সিন পর্যন্ত সকল প্রসিদ্ধ আনসার সাহাবিদের জীবনী বর্ণিত হয়েছে। শুরুতে তাদের ইসলাম-পূর্ব যুগের জীবনেতিহাস তুলে ধরা হয়েছে।[৫]

[৫] ইত্তিহাদ পাবলিকেশন প্রকাশিত বাংলা 'সিয়ারুস সাহাবা'র পঞ্চম খণ্ড।

২. **সিয়ারুল আনসার (দ্বিতীয় খণ্ড) :** এতে আরবি অক্ষর শিন থেকে ইয়া পর্যন্ত তাবৎ শীর্ষ আনসার সাহাবির জীবনী আলোচিত হয়েছে।[৬]

৩. **সিয়ারুস সাহাবিয়াত :** এতে মুহাজির ও আনসার-নির্বিশেষে সকল নারী সাহাবির জীবনী আলোচিত হয়েছে।[৭]

৪. **উসওয়ায়ে সাহাবা (প্রথম খণ্ড) :** এতে সাহাবিগণের আকিদা-বিশ্বাস, ইবাদত-বন্দেগি, আচার-ব্যবহার এবং তাদের মর্যাদার বাস্তব উদাহরণসহ সংকলিত করা হয়েছে।[৮]

৫. **উসওয়ায়ে সাহাবা (দ্বিতীয় খণ্ড) :** এতে সাহাবিগণের জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চা, পাঠদান, সামাজিক এবং প্রশাসনিক কীর্তি ও অবদানসমূহ তুলে ধরা হয়েছে।[৯]

আমাদের সহকর্মী বন্ধু হাজি মুঈনুদ্দিন নদভি সাহেব মুহাজিরদের অবস্থা, জীবনী-বিন্যাস ও সংকলনের দায়িত্ব নিজ কাঁধে উঠিয়ে নেন। কিন্তু অর্ধেক কাজ শেষ হতে না হতেই নদওয়াতুল উলামার কুতুবখানার সূচি তৈরির জন্য তাকে নির্বাচন করা হয়। সেখান থেকে ভাগ্য তাকে এশিয়াটিক সোসাইটি বাঙ্গাল পাঠাগারের অধীনে প্রথমে কলকাতা ও এরপর পাবলিক ওরিয়েন্টাল লাইব্রেরি পাটনায় নিয়ে যায়। দায়িত্বের ধকল তাকে সিয়ারুল মুহাজিরিনের অসমাপ্ত কাজটি সমাপ্ত করতে দেয়নি। অগ্যতা অসমাপ্ত অবস্থায়ই এ দায়িত্বটি ছেড়ে দিতে হয়। আমাদের সৌভাগ্য; ঘটনাচক্রে অসমাপ্ত কাজটি আঞ্জাম দিতে তারই নামের এক মাদরাজি ভাইকে আমরা পেয়ে যাই। তিনি দক্ষতার সঙ্গে পুর্ণোদ্দমে এই কাজ আঞ্জাম দিচ্ছেন।

সিয়ারুল মুহাজিরিন ইনশাআল্লাহ কয়েক খণ্ডে প্রকাশিত হবে। এখন 'খুলাফায়ে রাশেদিন' নামে প্রথম খণ্ডটি আপনাদের সামনে রয়েছে। মহান এই চার সাহাবির জীবনী ইসলামি ইতিহাসে ভিন্ন মর্যাদার দাবি রাখে। তাই এ খণ্ডে অন্য কোনো মুহাজির সাহাবির জীবনালোচনা করা হয়নি। অন্যদের জীবনালোচনার মতো এখানে হরফ-ক্রমকে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। এ খণ্ডে উঠে এসেছে তাদের ব্যক্তিগত জীবনের সকল দিক– তাদের জীবনাচার, চরিত্র, ব্যক্তিত্ব ও মাহাত্ম্য। পাশাপাশি চলে এসেছে তাদের আমলের রাষ্ট্রীয়

---

[৬] ইত্তিহাদ পাবলিকেশন প্রকাশিত বাংলা 'সিয়ারুস সাহাবা'র ষষ্ঠ খণ্ড।
[৭] ইত্তিহাদ পাবলিকেশন প্রকাশিত বাংলা 'সিয়ারুস সাহাবা'র একাদশ খণ্ড।
[৮] ইত্তিহাদ পাবলিকেশন প্রকাশিত বাংলা 'সিয়ারুস সাহাবা'র নবম খণ্ড।
[৯] ইত্তিহাদ পাবলিকেশন প্রকাশিত বাংলা 'সিয়ারুস সাহাবা'র দশম খণ্ড।

এবং প্রশাসনিক ইতিহাসও। তাই এই গ্রন্থটি খুলাফায়ে রাশেদিনের জীবনী হওয়ার পাশাপাশি তাদের পরিপূর্ণ ইতিহাসও বটে।

লেখক যথাসম্ভব হাদিসের গ্রন্থাদি থেকেই সাহায্য নেওয়ার চেষ্টা করেছেন। হাদিসের গ্রন্থে কোনো বিষয় না পেলে তিনি ইতিহাসের নির্ভরযোগ্য গ্রন্থাবলি—আখবারুত তিওয়াল, তারিখে তাবারি, তারিখে ইবনে আসির, তারিখে ইবনে খালদুন ও তারিখুল খুলাফা প্রভৃতি গ্রন্থ থেকে সাহায্য নিয়েছেন। তবে তিনি তুলনামূলকভাবে ইতিহাস থেকে সাহায্য খুব কম নিয়েছেন।

সাইয়েদ সুলাইমান নদভি
নাজেম, দারুন মুসান্নিফিন
৫ই সফর, ১৩৪৬ হিজরি

খলিফাতুর রাসুল আবু বকর সিদ্দিক রা.

(৫১ হিজরিপূর্ব-১৩ হিজরি : ৫৭৩-৬৩৪ খ্রিষ্টাব্দ)[৩০]

নাম ও বংশ

নাম আবদুল্লাহ। উপনাম আবু বকর। উপাধি সিদ্দিক ও আতিক। পিতার নাম উসমান। উপনাম আবু কুহাফা। মায়ের নাম সালমা, উপনাম উম্মুল খায়ের। পিতার দিক থেকে বংশতালিকা হচ্ছে, আবদুল্লাহ ইবনে উসমান ইবনে আমের ইবনে আমর ইবনে কাব ইবনে সাদ ইবনে তাইম ইবনে মুররা ইবনে কাব ইবনে লুয়াই আল-কুরাশি আত-তামিমি। মায়ের দিকের বংশতালিকা হচ্ছে, উম্মুল খায়ের বিনতে সাখার ইবনে আমের ইবনে কাব ইবনে সাদ ইবনে তাইম ইবনে মুররা।[৩১] এভাবে ষষ্ঠ পুরুষে গিয়ে আবু বকর সিদ্দিক রা.-এর বংশতালিকা নবীজির বংশতালিকার সঙ্গে মিলে যায়।

আবু বকর সিদ্দিক রা.-এর পিতা

আবু কুহাফা উসমান ইবনে মুররা ছিলেন মক্কার একজন সম্মানিত ও বয়স্ক ব্যক্তি। অন্যান্য বৃদ্ধরা শুরুর দিকে যেমন ইসলামকে ছেলেখেলা ভাবত, তেমনই তিনিও তা ভাবতেন। আবদুল্লাহ বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় হিজরত করলে আমি তার খোঁজে আবু বকরের ঘরে আসি। সেখানে তার পিতা আবু কুহাফা ছিলেন। তিনি একটি মোটা লাঠি নিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে আসেন। আমাকে দেখার পর তিনি লাঠি নিয়ে আমার দিকে তেড়ে এসে বলেন, 'এসকল ধর্মত্যাগীরাই আমার সন্তানকে নষ্ট করেছে।'[৩২]

মক্কা বিজয় পর্যন্ত আবু কুহাফা অত্যন্ত গর্বের সঙ্গে পিতৃপুরুষের ধর্মের উপর অটল থাকেন। মক্কা বিজয়ের পর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে হারামে অবস্থানকালে তিনি আপন সৌভাগ্যবান সন্তান আবু বকর

---

[৩০] আল-আলাম গ্রন্থকার (৪/ ১০২) আবু বকর সিদ্দিক রা.-এর নাম এভাবে লেখেন,

عبد الله بن أبي قُحَافَة عثمان بن عامر ابن كعب التيمي القرشي

[৩১] তাবাকাতে ইবনে সাদ : ৩/১২৫

[৩২] আল ইসাবাহ : ৪/৩৭৪

সিদ্দিক রা.-এর সঙ্গে রাসুলের নিকটে উপস্থিত হন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার বার্ধক্যজনিত দুর্বলতা দেখে বলেন, তাকে কেন কষ্ট দিলে? আমিই তার কাছে যেতাম! এরপর তিনি অত্যন্ত মহব্বতের সঙ্গে আবু কুহাফার বুকে হাত বুলিয়ে তাকে কালিমায়ে তাইয়্যেবা শিখিয়ে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করে নেন। আবু কুহাফা দীর্ঘজীবন লাভ করেছিলেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং আবু বকর রা.-এর পরও তিনি কিছুদিন জীবিত ছিলেন। জীবনের শেষদিকে তিনি অধিক দুর্বল হয়ে পড়েন। দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেন। অবশেষে চৌদ্দ হিজরিতে ৯৭ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন।[৩৩]

আবু বকর সিদ্দিক রা.-এর মাতা

তার সম্মানিতা মা সালমা বিনতে সাখার শুরুর দিকেই ইসলাম গ্রহণে ধন্য হন। তার পূর্বে মাত্র ৩৯ ব্যক্তি মুসলমান হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেন। এই ছোট্ট দল প্রকাশ্যে ইসলামের ঘোষণা দিতে পারছিলেন না। কাফের-মুশরিকদের প্রবল প্রতাপের দরুন তারা সুস্পষ্ট দীন ইসলামের দাওয়াতও দিতে পারছিলেন না। এই অসহায়ত্ব আবু বকর রা.-এর অন্তরকে পীড়া দিত। একদিন তিনি অনেক পীড়াপীড়ি করে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অনুমতি নিয়ে জনসম্মুখে ইসলামের সত্যতা ও সৌন্দর্য তুলে ধরেন। তাদেরকে মূর্তিপূজা ছেড়ে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দেন। কাফের-মুশরিকদের কান তো এমন সুন্দর কথার সঙ্গে অপরিচিত। ফলে তারা ভীষণ ক্ষেপে ওঠে। তাকে নির্দয়ভাবে নির্যাতন করে। তার গোত্র বনু তাইম যদিও মুশরিক ছিল, কিন্তু নিজ গোত্রের একজন সম্মানিত লোকের এ অবস্থা দেখে উত্তেজিত হয়ে ওঠে। তারা আবু বকর রা.-কে ওদের কবল থেকে মুক্ত করে বাড়িতে পৌঁছে দেয়। এই কষ্টের ভেতরেও রাতে আবু বকর আপন পিতা এবং গোত্রের লোকদের ইসলামের দাওয়াত দিতে থাকেন। সকালে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খোঁজ নিয়ে মাকে সঙ্গে করে আরকাম ইবনে আবুল আরকাম রা.-এর বাড়িতে উপস্থিত হন এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আবেদন করেন, আমার মা উপস্থিত। তাকে আপনি সঠিক পথ প্রদর্শন করুন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন তাকে ইসলামের দাওয়াত দিলে তিনি ইসলাম গ্রহণ করে ধন্য হন।[৩৪]

---

[৩৩] আল ইসাবাহ : ৪/৩৭৫

[৩৪] আল ইসাবাহ : ৮/৩৮৬

উম্মুল খায়েরও দীর্ঘ জীবন লাভ করেন। তিনি আবু বকর রা.-এর খেলাফতকাল পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। তবে স্বামীর পূর্বেই তিনি ইন্তেকাল করেন।[৩৫]

ইসলাম-পূর্ব জীবন

ইসলাম গ্রহণের পূর্বে আবু বকর রা. ছিলেন একজন ধনাঢ্য ব্যবসায়ী। চারদিকে ছিল তার সত্যবাদিতা ও বিশ্বস্ততার সুখ্যাতি। প্রজ্ঞা, অভিজ্ঞতা ও সদাচারের দরুন মক্কাবাসী তাকে খুব সম্মান করত। জাহেলি যুগে তার কাছেই রক্তপণ জমা হতো। অন্য কারও কাছে রাখা হলে কুরাইশরা তা মানত না।[৩৬] তিনি ইসলামি যুগে যেমন মদপানকে ঘৃণা করতেন, ইসলাম-পূর্ব জীবনেও তেমনই ঘৃণা করতেন। মদ সম্পর্কে এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, মদপানের মধ্যে মানুষের সম্ভ্রমের ক্ষতি রয়েছে।

নবীজির সঙ্গে ছিল তার আশৈশব বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক। অধিকাংশ ব্যবসায়িক সফরে তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গ লাভ করতেন।[৩৭]

ইসলাম গ্রহণ

নবুওয়াত লাভের পর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গোপনে আপন নিষ্ঠাবান বন্ধুদের কাছে ইসলামের কথা প্রচার করতে থাকেন। তখন পুরুষদের মধ্যে আবু বকর রা.-ই সর্বপ্রথম বাইয়াতের জন্য হাত বাড়িয়ে দেন। কতিপয় ইতিহাসবিদ তার ইসলাম গ্রহণ নিয়ে কাহিনি ফেঁদেছেন। কিন্তু এসব অনেকটা বাস্তবতা বহির্ভূত। প্রকৃত কথা হচ্ছে আবু বকর রা.-এর অন্তর আগে থেকেই ছিল স্ফটিকস্বচ্ছ। শুধু হকের আলো পড়াটুকুই অবশিষ্ট ছিল। বিগত দিনে রাসুলের সুদীর্ঘ সঙ্গ ও অভিজ্ঞতা নবীজির নবুওয়াতের বিষয়টি তার কাছে এতই স্পষ্ট করে দিয়েছিল যে, এই সত্যদ্রষ্টার কাছে অপেক্ষা করার কোনো প্রয়োজন বাকি থাকেনি। তবে তিনি সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেছেন কি না, এ নিয়ে ঐতিহাসিক ও হাদিস বিশারদগণ কিছুটা ভিন্নমত পোষণ করেছেন। কতিপয় বর্ণনা সূত্রে জানা যায়, মুমিন-জননী খাদিজা রা. সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন। এ ছাড়া কিছু বর্ণনায় দেখা যায়, সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণের মুকুট ছিল আলি রা.-এর মাথায়। অনেকে জায়েদ ইবনু হারেসা রা.-এর কথাও বলেছেন। কিন্তু এর বিপরীতে বহু বর্ণনা পাওয়া যায়, যেগুলো প্রমাণ করে সর্বপ্রথম গৌরব ছিল আবু বকর রা.-এর ভাগ্য-

---

[৩৫] আল ইসাবাহ : ৮/৩৮৬ সূত্র : আল-মুজামুল কাবির লিত তাবরানি : ১/৫২ (২)
[৩৬] আল ইসাবাহ : ৪/১৪৯
[৩৭] প্রাগুক্ত

আমিরুল মুমিনিন উমর ফারুক রা.

(৪০ হিজরিপূর্ব-২৩ হিজরি : ৫৮৪-৬৪৪ খ্রিষ্টাব্দ)[২৪৮]

নাম ও বংশ

তার নাম উমর। উপনাম আবু হাফস। উপাধি ফারুক। পিতার নাম খাত্তাব। মায়ের নাম হান্তামা। পূর্ণ বংশ হলো, উমর ইবনে খাত্তাব ইবনে নুফাইল ইবনে আবদুল উজ্জা ইবনে রিয়াহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে কুরত ইবনে রাজ্জাহ ইবনে আদি ইবনে কাব ইবনে লুআই ইবনে গালিব আল-কুরাইশি।[২৪৯] আদির অপর ভাই মুররা। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন মুররার বংশধর। এখানে এসে অষ্টম পুরুষে উমর রা.-এর বংশ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বংশের সঙ্গে মিলে যায়।

জাহেলি যুগ থেকে উমর রা.-এর পরিবার ছিল অত্যন্ত সম্মানিত। তার ঊর্ধ্বতন পুরুষ আদি আরবের পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদে কুরাইশের সালিশি করতেন। বিভিন্ন গোত্রের কাছে দূত হিসেবে প্রেরিত হতেন। বংশপরম্পরায় এই দায়িত্ব তাদের পরিবারেই বহাল থাকে। দাদার বংশের মতো উমর রা.-এর নানার বংশও ছিল অত্যন্ত সম্মানিত। তার মা হান্তামা হাশেম ইবনে মুগিরার মেয়ে ছিলেন। কুরাইশরা কোনো গোত্রের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হলে সেনাবাহিনী দেখাশোনার দায়িত্ব তাদের হাতেই থাকত।[২৫০]

উমর রা. হিজরতের ৪০ বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালের অবস্থা অজ্ঞাত। প্রাপ্তবয়স্ককালের অবস্থাও কমই জানা যায়। যৌবনে উপনীত হলে আরবদের অভিজাত বিষয়াদিতে যুক্ত হন। অর্থাৎ বংশ জ্ঞান, বীরত্ব, সেনা ট্রেনিং এবং ভাষণ বিবৃতিতে যোগ্যতা অর্জন করেন। বিশেষত তিনি

---

[২৪৮] আল-আলাম গ্রন্থকার (৫/ ৪৫) উমর ইবনে খাত্তাব রা.-এর নাম এভাবে লেখেন, عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي، أبو حفص.

[২৪৯] আল-ইসাবাহ : ৪/৪৮৪

[২৫০] ইকদুল ফরিদ, আরবের ফজিলত অধ্যায়।

অশ্বারোহণে পূর্ণতা অর্জন করেন। এসময় তিনি পড়াশোনাও শিখে ফেলেন। জাহেলি যুগে যারা পড়ালেখা জানতেন, তিনি ছিলেন তাদের একজন।[২৫১]

শিক্ষাদীক্ষা অর্জনের পর জীবিকা উপার্জনে মনোনিবেশ করেন। আরবের অধিকাংশ লোক ব্যবসা করত। এ কারণে তিনিও ব্যবসার পথ ধরেন। এ প্রেক্ষিতে দূরদূরান্তের বহু দেশ সফর করেন। বহু অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। তিনি প্রবল আত্মপ্রত্যয়ী, অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ও বিষয়াদি অনুধাবনের অধিকারী ছিলেন। এ জন্য কুরাইশরা তাকে দূতের দায়িত্ব প্রদান করে। বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে সমস্যা, সংকট তৈরি হলে তিনি দূত হিসেবে অসাধারণ যোগ্যতা ও বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে এ সমস্যার সমাধান করতেন।[২৫২]

তার বয়স যখন সাতাশ, তখন আরব ভূখণ্ডে ইসলামের সূর্য উদিত হয়। মক্কা থেকে তাওহিদের ধ্বনি উচ্চকিত হয়। উমর রা.-এর কাছে এ আওয়াজ ছিল সম্পূর্ণ অপরিচিত। তাই তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। এমনকি কেউ মুসলমান হয়েছে জানলে তিনি তার শত্রু হয়ে যেতেন। তার পরিবারের বাসিনা নামক এক বাঁদি মুসলমান হয়ে গেলে তিনি তাকে এত প্রহার করতেন যে, প্রহার করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়তেন। বাসিনা রা. ছাড়াও আরও যেসকল মানুষের উপর তিনি কর্তৃত্ব খাটাতে পারতেন, তাদের কেউ মুসলমান হওয়ার সংবাদ পেলে উমর রা. তাদের উপরও নির্যাতন চালাতেন। কিন্তু ইসলামের প্রতি তাদের আগ্রহ ছিল অপ্রতিরোধ্য। কোনো নির্যাতনই একটি মানুষকেও ইসলাম থেকে ফেরাতে পারেনি।

ফারুকে আজম রা.-এর ইসলাম গ্রহণ

কুরাইশের নেতৃস্থানীয়দের মধ্যে আবু জাহেল ও উমরই ইসলাম ও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে প্রধানতম ভূমিকা পালন করতেন। তাই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশেষভাবে তাদের উভয়ের হেদায়েতের জন্য দোয়া করেন। তিনি বলেন,

اللهمّ أعزّ الإسلامَ بأحبِّ هذين الرجلين إليك بأبي جهلٍ أو بعمرَ بنِ الخطابِ

‘হে আল্লাহ! আবু জাহেল ও উমর ইবনে খাত্তাবের মধ্যে যে আপনার কাছে বেশি প্রিয়, তার মাধ্যমে ইসলামকে শক্তিশালী করুন।’[২৫৩]

---

[২৫১] আল-ইসতিআব, উমর ইবনে খাত্তাব রা.-এর জীবনী দ্রষ্টব্য।

[২৫২] আল-ইসতিআব : ৩/১১৪৫; ফুতুহুল বুলদান : ৪৭৭

[২৫৩] জামে তিরমিজি : ৩৬৮১ উমর রা.-এর মর্যাদা অধ্যায়; মুসনাদে আহমাদ : ৫৬৯৬

আল্লাহ তায়ালা তো এ সৌভাগ্য উমর রা.-এর ভাগ্যে লিখে রেখেছিলেন। তাই আবু জাহেল এ সৌভাগ্য পায় কী করে? এই দোয়ার ফলে কিছুদিন পর ইসলামের সবচেয়ে বড় দুশমন, ইসলামের সবচেয়ে বড় বন্ধু ও প্রাণ উৎসর্গকারী হয়ে যান। অর্থাৎ উমর রা. ইসলাম গ্রহণ করেন। আর এটা তো আল্লাহর অনুগ্রহ। তিনি যাকে চান কেবল তাকেই তা দান করেন। ইতিহাস ও সিরাতের গ্রন্থাদিতে উমর রা.-এর ইসলাম গ্রহণের বিস্তারিত বিবরণ নিয়ে মতভিন্নতা রয়েছে।

একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা, যা সিরাতের সকল লেখকগণই লিপিবদ্ধ করে থাকেন। ঘটনাটি হলো, উমর রা. কঠিন অত্যাচারের পরও এক ব্যক্তিকে ইসলাম থেকে ফেরাতে ব্যর্থ হয়ে খোদ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হত্যা করার সংকল্প করেন। কোমরে তরবারি ঝুলিয়ে সোজা রাসুলের কাছে যাওয়া শুরু করেন। ঘটনাচক্রে পথে নুয়াইম ইবনে আবদুল্লাহ রা.-এর সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়। উমরকে উত্তেজিত দেখে তিনি জিজ্ঞেস করেন, ভালো আছ? উমর রা. বলেন, আমি মুহাম্মাদের ফায়সালা করতে যাচ্ছি। নুয়াইম বললেন, আগে তো নিজ ঘরের খবর নেবে। তোমার বোন এবং ভগ্নিপতিই তো ইসলাম গ্রহণ করেছে। উমর তৎক্ষণাৎ বোনের ঘরের দিকে হাঁটা ধরেন। বোন উমরের পায়ের আওয়াজ পেয়ে তেলাওয়াত বন্ধ করে কুরআনের পৃষ্ঠাগুলো লুকিয়ে ফেলেন। কিন্তু উমর কুরআন তেলাওয়াতের আওয়াজ পেয়ে গিয়েছিলেন। বোনকে জিজ্ঞেস করেন, কী করছিলে? বোন বলল, কিছুই না। তিনি বলেন, শুনতে পেলাম তোমরা নাকি ধর্মত্যাগী হয়ে গেছ। কথাটা বলে তিনি ভগ্নিপতির উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। বোন বাঁচাতে এলে উমর তাকেও প্রহার শুরু করেন। এমনকি তার শরীর রক্তাক্ত হয়ে যায়। কিন্তু নির্যাতন তাদেরকে ইসলাম থেকে সামান্যতম ফেরাতে পারেনি। বোন বলেন, উমর! যা ইচ্ছে করতে পারো। কিন্তু অন্তর থেকে ইসলাম বের করতে পারবে না। এ বাক্যটি উমরের মনে গভীর রেখাপাত করে। বোনের দিকে তিনি মমতার দৃষ্টিতে তাকান। দেখতে পান তার দেহ থেকে রক্ত ঝরছে। এটা দেখে তার হৃদয় বিচলিত হয়ে ওঠে। বলেন, কী পড়ছিলে সেটা আমাকে একটু শোনাও। ফাতেমা রা. কুরআনের অংশগুলো সামনে এনে রাখেন। তিনি হাতে উঠিয়ে দেখেন তাতে নিম্নোক্ত আয়াতগুলো লেখা রয়েছে,

سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ۚ وَ هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ

'আসমান-জমিনের সবকিছু আল্লাহ তায়ালার তাসবিহ পাঠ করে। আর তিনি পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়।'[২৫৪]

---

[২৫৪] সুরা হাদিদ : ১

আমিরুল মুমিনিন উসমান ইবনে আফফান জুননুরাইন রা.

(৪৭ হিজরিপূর্ব-৩৫ হিজরি : ৫৭৭-৬৫৬ খ্রিষ্টাব্দ)[৪৮৪]

নাম ও বংশ

নাম উসমান। উপনাম আবু আবদুল্লাহ ও আবু আমর। উপাধি জুননুরাইন। পিতার নাম আফফান। মায়ের নাম আরওয়া। পিতার দিক থেকে তার বংশধারা হলো, উসমান ইবনে আফফান ইবনে আবুল আস ইবনে উমাইয়া ইবনে আবদে শামস ইবনে আবদে মানাফ ইবনে কুসাই আল-কুরাশি। মায়ের দিক থেকে বংশধারা হলো, আরওয়া বিনতে কুরাইজ ইবনে রবিয়া ইবনে হাবিব ইবনে আবদে শামস ইবনে আবদে মানাফ। এভাবে পঞ্চম পুরুষে আবদে মানাফের মাধ্যমে উসমান রা.-এর বংশ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে মিলিত হয়। উসমান রা.-এর নানি বায়জা উম্মে হাকিম আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল মুত্তালিবের সহোদর বোন এবং নবীজির ফুফু হয়ে থাকেন। এই কারণে উসমান রা. মায়ের দিক থেকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আত্মীয় হন।[৪৮৫] তিনি রাসুলের দুই মেয়েকে বিয়ে করেছিলেন বিধায় তাকে জুননুরাইন বলা হয়।

জাহেলি যুগেও উসমান রা.-এর বংশ সম্ভ্রান্ত ও সম্মানিত হিসেবে গণ্য হতো। তার প্রপিতামহ উমাইয়া ইবনে আবদে শামস কুরাইশের সর্দার ছিলেন। উমাইয়া খলিফাগণকে তার দিকেই সম্পর্কিত হয়ে উমাবি নামে প্রসিদ্ধ হয়েছেন। কুরাইশদের জাতীয় পতাকা উকাব তারাই বহন করতেন। ফিজার যুদ্ধে এই বংশের খ্যাতিমান সর্দার হারব ইবনে উমাইয়া সেনাপতির দায়িত্ব পালন করেন। ইসলামের বড় শত্রু উকবা ইবনে আবু মুআইতও উমাবি ছিল।

---

[৪৮৪] আল-আলাম গ্রন্থাকার (৪/ ২১০) উসমান ইবনে আফফান রা.-এর নাম এভাবে লেখেন,
عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية، من قريش: أمير المؤمنين.

[৪৮৫] ফাতহুল বারি, মর্যাদা অধ্যায়, ৩৬৯৫ নং হাদিসের পূর্ব আলোচনা ও ৩৬৯৬ নং হাদিসের অধীন আলোচনা।

ইসলাম গ্রহণের আগে বদর ছাড়া সব যুদ্ধে কুরাইশদের নেতৃত্বদানকারী আবু সুফিয়ান ইবনে হারবও ছিলেন একজন উমাবি। মোটকথা, নেতৃত্ব, মর্যাদা, যুদ্ধ প্রভৃতি দিক থেকে উসমানের বংশ আরবে অত্যন্ত সম্মানিত ছিল। বনু হাশেম ছাড়া অন্য কোনো বংশ তাদের সমকক্ষ ছিল না।

হস্তি বাহিনী কর্তৃক মক্কা আক্রমণের ছয় বছর পর তথা হিজরতের ৪৭ বছর পূর্বে উসমান রা. জন্মগ্রহণ করেন। তার শৈশব ও কৈশোরকাল সম্পর্কে বিস্তারিত জানা না গেলেও এটুকু ধারণা করা হয়, তিনি সাধারণ আরবদের বিপরীতে লেখাপড়া শিখেছিলেন। যৌবনে তিনি ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু করেন এবং সততা, বিশ্বস্ততা ও সত্যবাদিতার মাধ্যমে বিপুল উন্নতি লাভ করেন।

ইসলাম গ্রহণ

উসমান রা.-এর বয়স যখন ৩৪ বছর, মক্কা তখন তাওহিদের আওয়াজে মুখর হয়ে ওঠে। তৎকালীন ধর্মীয় কুসংস্কারে ঘেরা পরিবেশে উসমান রা.-এর কাছে এ আওয়াজ অপরিচিত হলেও স্বভাবগত পবিত্রতা, বিশ্বস্ততা ও সততার কারণে হকের আওয়াজে লাব্বাইক বলার জন্য প্রস্তুত হয়ে যান।

আবু বকর সিদ্দিক রা. ঈমান গ্রহণের পর ইসলাম প্রচার-প্রসারকে জীবনের ব্রত বানিয়ে নেন। তিনি আপন বন্ধুমহলে হেদায়াতের প্রচারকাজ শুরু করে দেন। জাহেলি যুগ থেকেই তার সঙ্গে উসমান রা.-এর সম্পর্ক ছিল গভীর। তাদের এ সম্পর্ক ছিল নিষ্ঠাপূর্ণ। একদিন উসমান রা. আবু বকর রা.-এর নিকটে এলে আবু বকর রা. যথারীতি ইসলামের ব্যাপারে কথাবার্তা বলা শুরু করেন। আবু বকর রা.-এর আলোচনায় এতই প্রভাবিত হন যে, তখনই নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত হয়ে ইসলাম গ্রহণে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। তারা উভয় যখন রাসুলের কাছে যাবেন, ঠিক সে মুহূর্তে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে এসে উপস্থিত হন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন উসমান রা.-কে লক্ষ করে বলেন, উসমান! আল্লাহর জান্নাত কবুল করে নাও। আমি তোমার এবং গোটা সৃষ্টির হেদায়াতের জন্য প্রেরিত হয়েছি। উসমান রা. বলেন, 'আল্লাহ ভালো জানেন, নবীজির এই সরল কথাগুলোর মধ্যে কী প্রভাব বিদ্যমান ছিল। কথাগুলো শুনে আমি নিজের অজান্তেই কালিমায়ে শাহাদাত পড়তে থাকি এবং রাসুলের দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে ইসলামে প্রবেশ করি।'[৪৮৬]

---

[৪৮৬] আল-ইসাবাহ : ৮/১৭৭, সা'দা বিনতে কুরাইজের আলোচনা দ্রষ্টব্য।

এখানে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, উসমান রা. ছিলেন সেই বনু উমাইয়ার সদস্য, যারা ছিল বনু হাশেমের প্রতিপক্ষ। তারা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সফলতাকে এ জন্য ভীতি ও হিংসার দৃষ্টিতে দেখত যে, মুহাম্মাদের সফলতার ফলে আরবের নেতৃত্বের বাগডোর তাদের হাত থেকে বেরিয়ে বনু হাশেমের হাতে চলে যাবে। এই কারণেই উকবা ইবনে আবু মুআইত ও আবু সুফিয়ানরা ইসলামি আন্দোলনকে মিটিয়ে দেওয়ার জন্য উঠেপড়ে লেগেছিল। উসমান রা.-এর হৃদয়দর্পণ এসব বংশীয় সাম্প্রদায়িকতার কালিমা থেকে পরিচ্ছন্ন ছিল। এগুলো কখনোই তার অন্তরকে কলুষিত করতে পারেনি। তিনি অত্যন্ত স্বাধীনভাবে বংশের বিরুদ্ধে গিয়ে হকের আওয়াজে লাব্বাইক বলেন। অথচ তখন মাত্র পঁয়ত্রিশ থেকে ছত্রিশ জন নারী-পুরুষ ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

বিয়ে

ইসলাম গ্রহণের পর উসমান রা. সেই মর্যাদা লাভ করে, যা ছিল তার জীবনের সমুজ্জ্বল অধ্যায়। অর্থাৎ নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কাছে নিজ কন্যাকে বিয়ে দেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তনয়া রুকাইয়া রা. ইতিপূর্বে ছিলেন আবু লাহাবতনয় উতবার বিবাহ বন্ধনে। ইসলাম আগমনের পর উতবার পিতা আবু লাহাব রাসুলের ঘোরতর শত্রু হয়ে ওঠে। সে তার ছেলের উপর চাপ প্রয়োগ করে রুকাইয়া রা.-কে তালাক দেয়। তালাকের পর নবীজি উসমান রা.-এর সঙ্গে তাকে বিয়ে দেন। এই বিয়ে নিয়ে কিছু অর্থহীন কথাবার্তা কিতাবাদিতে পাওয়া যায়। এগুলো সম্পূর্ণ মিথ্যা ও বানোয়াট। হাদিসবিশারদগণ এগুলোকে বানোয়াটের তালিকায় যুক্ত করে থাকেন।

হাবশায় হিজরত

মক্কায় ইসলামের উন্নতি ও অগ্রগতি কুরাইশদের ক্রোধ ও হিংসার ক্রমশ বাড়াতে থাকে। প্রভাব-প্রতিপত্তি ও বংশীয় আভিজাত্যের পরও উসমান রা. অন্যান্য মুসলমানদের মতোই জুলুম-নির্যাতনের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হন। তার চাচা তাকে বেঁধে প্রহার করেন।[৪৮৭] দিনদিন নিকটাত্মীয়দের বিরূপ আচরণ ও কঠোরতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। একসময় তা ধৈর্যের সীমা ডিঙিয়ে যায়। অবশেষে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুমতি নিয়ে স্ত্রী রুকাইয়া রা.-কে সঙ্গে করে হাবশায় রওনা হয়ে যান। এটি ছিল সেই প্রথম

[৪৮৭] তাবাকাতে ইবনে সাদ : ৩/৪০

আমিরুল মুমিনিন আলি মুরতাজা রা.

(২৩ হিজরিপূর্ব-৪০ হিজরি : ৬০০-৬৬১ খ্রিষ্টাব্দ)[৬৪২]

নাম ও বংশ

নাম আলি। উপনাম আবুল হাসান ও আবু তুরাব। উপাধি হায়দার। পিতার নাম আবু তালেব। মাতার নাম ফাতেমা। তার বংশধারা হলো, আলি ইবনে আবু তালেব ইবনে আবদুল মুত্তালিব ইবনে হাশেম ইবনে আবদে মানাফ ইবনে কুসাই ইবনে কিলাব ইবনে মুররা ইবনে কাব ইবনে লুআই। আবু তালেব আপন চাচাতো বোনকে বিয়ে করায় আলি রা. মাতাপিতা উভয় দিক থেকে ছিলেন হাশেমি। এ ছাড়া তিনি ছিলেন প্রিয়নবীর আপন চাচাতো ভাই।

বলা বাহুল্য, আরব ও কুরাইশ গোত্রের মধ্যে বনু হাশেম অত্যন্ত সম্মানিত ছিল। বাইতুল্লাহর খেদমত এবং তার তত্ত্বাবধানের মতো মর্যাদাপূর্ণ দায়িত্ব ছিল বনু হাশেমের অনন্য মর্যাদার পরিচায়ক। এই মর্যাদার কারণে বনু হাশেম গোটা আরবের ধর্মীয় নেতৃত্বের আসনে ছিল।

আলি রা.-এর পিতা আবু তালেব ছিলেন মক্কার একজন সম্মানিত ব্যক্তি। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তারই প্রতিপালনে বেড়ে ওঠেন। নবুওয়াত লাভের পর তার সহায়তার ছত্রছায়ায় মক্কার কুফুরি ভূখণ্ডে প্রকাশ্যে ইসলামের দাওয়াত দেন। আবু তালেব সব সময় জান-প্রাণ দিয়ে রাসুলের পাশে থাকেন। তাকে কাফেরদের জুলুম-নির্যাতন থেকে নিরাপদ রাখেন। নবীজিকে সহায়তা প্রদানের অপরাধে কুরাইশরা আবু তালেবসহ তার বংশের লোকদের বিভিন্নভাবে কষ্ট দেয়। তারা তাদেরকে এক গিরি উপত্যকায় বন্দি করে রাখে। তাদের সঙ্গে লেনদেন, বিয়ে-শাদিসহ সর্বপ্রকার সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলে। এমনকি আহারসামগ্রী পৌঁছানোও বন্ধ করে দেয়। এতৎসত্ত্বেও আবু তালেব জীবনের শেষমুহূর্ত পর্যন্ত প্রিয়তম ভাতিজার মাথা থেকে স্নেহের হাত সরিয়ে নেননি।

---

[৬৪২] আল-আলাম গ্রন্থকার (৪/ ২৯৫) আলি ইবনে আবি তালেব রা.-এর নাম এভাবে লেখেন,

علي بن أبي طالب بن عبد المطلب الهاشمي القرشي، أبو الحسن.

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সব সময় আকাঙ্ক্ষা করতেন, আবু তালেব যেন ঈমান নিয়ে আসেন। ঈমানের মাধ্যমে যেন তার অন্তর আলোকিত হয়ে যায়। তিনি দুনিয়ার জীবনে রাসুলের জন্য যে ত্যাগ ও কষ্ট স্বীকার করছেন, এর বিনিময়ে যেন চিরস্থায়ী জান্নাতুল ফেরদাউস লাভ করেন। এজন্য আবু তালেবের মৃত্যুর সময়ও তিনি বারবার তাকে তাওহিদের দাওয়াত দিতে থাকেন। আবু তালেব তখন বলেন, 'প্রিয় ভাতিজা, কুরাইশদের অপবাদ আরোপের আশঙ্কা না থাকলে অবশ্যই আমি আনন্দের সঙ্গে তোমার দাওয়াত কবুল করতাম।[৬৪৩] সিরাতে ইবনে হিশামে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, মৃত্যুর সময় আবু তালেবের জবানে কালিমা উচ্চারিত হয়েছিল। তবে এই বর্ণনাটি নিতান্ত দুর্বল। আবু তালেব যদিও ইসলাম কবুল করেননি, তবুও নবীজিকে প্রতিপালন, তার জন্য আত্মত্যাগ, কুরবানি ও সাহায্যের দায়িত্ব পালন করায় ইসলামের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

আলি রা.-এর মাতা ফাতেমা বিনতে আসাদ আমেনার এই এতিম মাসুম বাচ্চাকে সন্তানের মতোই আদর-যত্ন ও মহব্বত করতেন। নির্ভরযোগ্য বর্ণনামতে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি হিজরত করে মদিনায় গমন করেছিলেন। তার ইন্তেকাল হলে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ জামায় তাকে কাফন দেন। তিনি তার কবরে শুয়ে সেটিকে বরকতময় করেন। লোকেরা এর কারণ জিজ্ঞেস করলে বলেন, 'আবু তালেবের পর আমি এই নেককার পুণ্যবতী নারীর কৃতজ্ঞতায় আবদ্ধ।'[৬৪৪]

আলি রা. নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াত লাভের ১০ বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন। আবু তালেবের পরিবার-পরিজনের লোকসংখ্যা ছিল বেশি, ফলে তাকে টানাটানির মধ্য দিয়ে জীবনযাপন করতে হচ্ছিল। দুর্ভিক্ষ তার এই কষ্টকে আরও বাড়িয়ে তোলে। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রিয়তম চাচার এ কষ্ট দেখে আব্বাস রা.-কে বলেন, চাচার এ দুরবস্থায় তাকে যথাসম্ভব সহায়তা দেওয়া উচিত। সুতরাং আব্বাস রা. জাফরের এবং নবীজি আলি রা.-এর ভরণপোষণের দায়িত্ব নিজ নিজ কাঁধে উঠিয়ে নেন। তখন থেকে আলি রা. নবীজির সার্বক্ষণিক সঙ্গী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেন।[৬৪৫]

---

[৬৪৩] সিরাতে ইবনে হিশাম : ১/৪১৮

[৬৪৪] উসদুল গাবাহ : ৭/২১২

[৬৪৫] সিরাতে ইবনে হিশাম : ১/২৪৫, ২৪৬

ইসলাম গ্রহণ

আলি রা.-এর বয়স যখন ১০ বছর, তখন তার লালনপালনকারী দরদি মুরব্বি মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে নবুওয়াত লাভ করেন। আলি রা. সব সময় রাসুলের সঙ্গে থাকায় তিনিই সর্বপ্রথম ইসলামের ধর্মীয় রীতিনীতি প্রত্যক্ষ করার গৌরব অর্জন করেন। একদিন তিনি নবীজি ও উম্মুল মুমিনিন খাদিজা রা.-কে ইবাদতে দেখতে পান। দৃশ্যটি তার ছোট্ট অন্তরে গভীর রেখাপাত করে। শিশুসুলভ বিস্ময় নিয়ে জিজ্ঞেস করেন, আপনারা কী করছিলেন? নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন তাকে নবুওয়াত লাভের কথাটি বুঝিয়ে বলেন। পাশাপাশি কুফর ও শিরকের জঘন্যতা তুলে ধরেন। তাওহিদের দাওয়াত দেন। আলি রা.-এর কান এমন কথার সঙ্গে পরিচিত ছিল না। পেরেশান হয়ে বলেন, আমি কি আব্বা আবু তালেবকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করব? তখন প্রকাশ্যে ইসলামের দাওয়াত দেওয়া নবীজির উদ্দেশ্য ছিল না, তাই তাকে বলেন, চাইলে এ ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করতে পারো, তবে কারও সঙ্গে আলোচনা কোরো না। প্রিয়নবীর প্রতিপালন থাকায় আলি রা.-এর স্বভাবজাত গুণাবলি উৎকৃষ্ট হয়ে ওঠেছিল। তার উপর আল্লাহর তাওফিকও তার সঙ্গ দিচ্ছিল। তাই তাকে বেশি চিন্তাভাবনা করতে হয়নি। দ্বিতীয় দিনই তিনি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন।[৬৪৬]

খাদিজাতুল কুবরা রা.-এর পর কে প্রথম ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এ নিয়ে ভিন্নমত দেখতে পাওয়া যায়। কতিপয় বর্ণনা আবু বকর রা.-এর কথা এবং কতিপয় বর্ণনা আলি রা.-এর কথা বলতে দেখা যায়। আবার কোনো বর্ণনায় জায়েদ ইবনে হারেসা রা.-কে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারী বলা হয়। মুহাক্কিক ওলামায়ে কেরাম বর্ণনাগুলোকে এভাবে সমন্বিত করেন যে, নারীদের মধ্যে খাদিজাতুল কুবরা রা., স্বাধীন পুরুষদের মধ্যে আবু বকর সিদ্দিক রা., গোলামদের মধ্যে জায়েদ ইবনে হারেসা রা. এবং বালকদের মধ্যে আলি ইবনে আবু তালেব রা. সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন।[৬৪৭]

মক্কিজীবন

ইসলাম গ্রহণের পর আলি রা. ১৩ বছর মক্কায় জীবনযাপন করেছেন। তিনি রাতদিন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে থাকতেন। সে সুবাদে

[৬৪৬] সিরাতে ইবনে ইসহাক, পৃষ্ঠা : ১৩৭; উসদুল গাবাহ : ৪/৮৭
[৬৪৭] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৩/১৫